কিছু টুকরো ছায়াময় ইশারা

নমিতা চৌধুরী

বৃষ্টি এলে মেঘের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে সেই ছোটবেলার দিনগুলোতে অনায়াসে ফিরে যেতে পারি। ফিরে যেতে পারি আমাদের সেই ঝুলন যাত্রার দিনগুলোতে। মাটির বারান্দার একপাশে তৈরী হচ্ছে ঝর্ণা, পাহাড়, জঙ্গল, রাস্তা, রেললাইন তার সঙ্গে মানানসই সব পুতুল। দোলনায় রাধাকৃষ্ণ দুলছে। চোখ বন্ধ করলেই এই দৃশ্য এখনো যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রতি বছরই ঝুলন যাত্রার দিনগুলোতে সেজে উঠতো আমাদের বারান্দার একটি অপরিসর কোণ। সবাই খুব তারিফ করতেন। আমাদেরও গর্বের সীমা থাকত না। এই সব কিছুর আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন যোগেন সেজদা, মনীন্দ্র ছোড়দা এবং পাড়ার আর ও কয়েকজন। কত পরিকল্পনা করে দীর্ঘদিন যাবৎ অসম্ভব পরিশ্রম করে এক একটি পুতুল তৈরি করতেন ওঁরা, কোথায় কীভাবে সেগুলোকে সাজানো হবে সেই নিয়ে কত ভাবতেন সারাক্ষণ। আমি শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম

আমাদের ছোটবেলাটা কেটেছে এক সৃষ্টিধর্মী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। এই আবহওয়াতে বেড়ে ওঠায় আমরাও সহজেই নিশ্বাস নিতে পেরেছিলাম। পেরেছিলাম শৈশব কৈশোরের অনাবিল আনন্দের ধারাকে স্পর্শ করতে। আমাদের বিত্ত ছিল না ছিল মানসিক বৈভব। ছিল ছড়ানো ছিটোনো বুনো ফুলের মত বন্ধনহীন বেড়ে ওঠা।

দাদাদের তৈরী কিশোর সংঘ ক্লাবের নানান সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ছিল সারা বছর ধরে। নাটক, গান, ছবি আঁকার প্রদর্শনী, রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, হাতে লেখা দেওয়াল এবং শারদীয়পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি। ক্লাবে সরস্বতী পুজোও হত। যোগেন নিজের হাতে সরস্বতী ঠাকুর তৈরী করতেন। প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে ওঠা সেই মূর্তি দেখতে দেখতে আনন্দে বিহ্বল আমরা অপেক্ষা করতাম কবে পুজোর দিনটি হাজির হবে। পুজোর আগে এবং পরে কত অনুষ্ঠান। কত মজা কত আনন্দ। চাঁদার বই হাতে আমরাও ঘুরতাম। কেউ দিত চার আনা কেউ আট আনা কেউ যদি একটাকা কিম্বা দু টাকা দিত তবে তো আনন্দের সীমা থাকতো না। আর তারপর ছিল সেই মজা, চাঁদা দেবার আগে নামের বানান এবং সরস্বতী বানান জিজ্ঞেস করা। মনে আছে খুব মুখস্থ করতাম আগে দন্ত্য স পরে ব ফলা। সরস্বতী পুজোয় মাইকে গান বাজানো হত, সেই বছরের লতা-হেমন্ত-সন্ধ্যার পুজোর গান। হেমন্তের রবীন্দ্র সংগীত 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়'। সেই সময় তো এত মাইক বাজতো না আর সবার ঘরে ঘরে রেডিও ও ছিল না। ফলে গানের সুর কথা আমাদের মন প্রাণ মাতিয়ে রাখতো। কোন চটুল গান কিংবা হিন্দী গান বাজানো যাবে না এই বিষয়ে বড়দের কড়া নির্দেশ ছিল।

প্রায় নিয়মিতই প্রকাশ পেত 'কিশলয়' দেওয়াল পত্রটি। তখন আমাদের মধ্যে ছড়া কবিতা ছবি আঁকার ধুম পড়ত।

সকলের লেখা কবিতা, ছড়া, গল্প যোগাড় করে, নিজের লেখা দিয়ে, হাতে লিখে ছবি এঁকে এক অনবদ্য শারদ সংকলন 'কিশলয়' প্রকাশ পেত যোগেনের আগ্রহে। সঙ্গে থাকতেন প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, শিবেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত। নিজের নাম বদলে বকুল চৌধুরী ছদ্মনামেও অনেক লেখা লিখেছেন যোগেন। পরবর্তীকালে 'কিশলয়' পত্রটির সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছিলাম আমিও। দীপায়নের সংগ্রহ থেকে পত্রিকাটির কিছু ছবি এবং লেখার অংশ তুলে দিলাম।

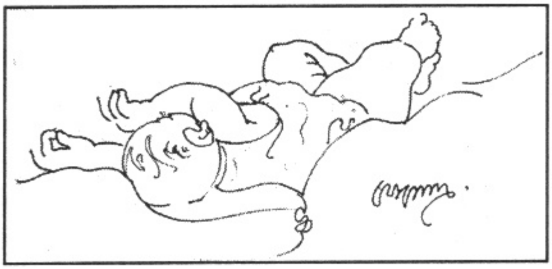

কিশোর সংঘে বার্ষিক ছবির প্রদর্শনী হত। একবার মনে আছে ছোটদের ছবি নেওয়া হবে, আমি খুব যত্ন করে দেখে দেখে একটি অপরাজিতা ফুল ও গাছের ছবি এঁকেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল কী সুন্দর এঁকেছি আমি এটি নিশ্চয়ই প্রদর্শনীতে স্থান পাবে। কিন্তু যোগেন সেটি বাতিল করে দিলেন এবং তার বদলে অন্য দুটি ছবিকে প্রদর্শনীর জন্য বেছে নিলেন। আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম কিন্তু কিছু বলতে পারিনি । এখন অবশ্য সহজেই বুঝতে পারি সত্যিই সেদিন কেন আমার নকল করা ছবিটি বাতিল হয়েছিল।

নাটকের মহড়া দিতেন দাদারা। আমি অরুণ এবং আরও কয়েকজন থাকতাম দর্শক। কোন নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়েছিল কিনা তা আর এখন মনে নেই। চলত 'চানক্য' 'পণ্ডিত বিদায়' নাটকের মহড়া । পুকুরপারে বাঁশগাছের জঙ্গলের মধ্যে কী উত্তেজনার মধ্য দিয়েই না সেই মহড়া চলত। কী যে তার উদ্দেশ্য ছিল এখন আর বুঝে পাই না। ওদের ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের নানান উদ্ভাবনী শক্তিতে আমি বেশ মোহিত ছিলাম শুধু এটুকু বলতে পারি। খাটের উপর কাপড় চাদর টানিয়েও হত কোন কোন নাটক। পোষাক টোষাক তেমন ছিল না। আর যাই হোক দাদাদের সঙ্গে ঘুর ঘুর করে নাটকের উত্তেজনা পোহানোর মজাটা বেশ উপভোগ করতাম সেই সময়।

খুব ছোটবেলা থেকেই আমি বেশ গড় গড় করে পড়তে পারতাম। আমার প্রথম পাঠ্য পুস্তক হিসেবে যে বইটি এল সেটির নাম ' ভোরের কাকলি'। এক সন্ধ্যায় যোগেন সেটি কিনে আমার হাতে দিলেন। মলাটে ছবি ছিল দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ের। রঙ ছিল হলুদ আর নীল। ভীষণ প্রিয় সেই বইটিকে নিয়ে আমি রোজ দুলে দুলে পড়তাম, 'বৃহস্পতিবার বারবেলাতে হারিয়ে গেছে গাই বিস্ফারিত লোচনেতে ভাবিতেছি তাই'। 'লোচন' এই শুনতে খারাপ শব্দটির অর্থ যে চোখ সেটা আমার মোটেই পছন্দের ছিল না। সে যাই হোক।যোগেন পড়াশুনায় বেশ ভালো ছিলেন। ফলে তখনকার নিয়ম অনুযায়ী ওঁকে এক ক্লাস ডিঙ্গিয়ে উঁচু ক্লাসে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আলাদা কোন গৃহশিক্ষক ছিল না এমন কি বাড়িতে দেখাবারও কেউ ছিলেন না শুধুমাত্র নিজের অধ্যবসায়ের দরুন ভালোভাবেই ইস্কুলের পরীক্ষাগুলোতে পাশ করতে পেরেছেন। আমাদের পড়াশুনার বিষয়েও ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। রাতে হ্যারিকেনের আলোকে ঘিরে আমরা যখন পড়তে বসতাম যোগেন তখন প্রায়ই খাতা পেন্সিল নিয়ে স্কেচ করতে বসতেন। আমরা আড়চোখে দেখতাম কী আঁকা হচ্ছে। কখনো ছোড়দার মুখ, কখনো আমার, কখনো অন্য কিছুর। আমার পেছন ফেরা একটি ছবির লিথোগ্রাফ এখনো আছে। মাথায় কাপড় জড়ানো একটি জলরঙের ছবির কথাও মনে আছে বেশ। সেই সময় ছোড়দার মুখের একটি সুন্দর ড্রইং করেছিলেন তিনি। ইস্কুলের গন্ডী পেরিয়ে যোগেন ভর্তি হন সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে। মেজদার কাছে শুনেছি প্রথমদিন দারোয়ান নাকি বিশ্বাস করতেই চায়নি যে ওঁ সত্যি সত্যি

কলেজের ছাত্র। সহপাঠিনী অনিতাদিও অনেকবার বলেছেন, 'তাঁদের ক্লাসে' সব থেকে ছোট ছিল যোগেন, মুখ নিচু করে থাকত সবকিছু বুঝত এবং খেয়াল রাখত।

আমি বিনোদিনী ইস্কুলে ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়ি তখন। ক্লাসের বন্ধুদের আকর্ষণ করার জন্য মাঝে মাঝেই যোগেনের আঁকা ছবি লুকিয়ে নিয়ে যেতাম — কোনদিন অপু দুর্গার বৃষ্টি ভেজার, কোনদিন বাউলের, কোনদিন পুতুল খেলার ছবি। দেখিয়ে বাহবা কুড়োতাম বেশ। আমার তখন মনে হত সব কৃতিত্বের অধিকারী আমি নিজেই। ক্লাসে যে আমি ভাল অঙ্ক পারি না এই ছবিগুলো দেখিয়ে সেটা পুষিয়ে নিতাম যেন।

ঘন ঘন জ্বর হত আমার ছেলেবলায়। প্রায়ই ইস্কুলে যেতে পারতাম না, আর বাড়িতে শুয়ে বসে গল্পের বই পড়তাম তখন। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য, রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, সুকান্তর ঘুম নেই, ছাড়পত্র, মিঠেকড়া, নজরুলের সঞ্চিতা পড়ার পাশাপাশি দাদাদের আনা বইগুলোও আমি নাড়াচাড়া করতাম। বড়দা নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন বামপন্থায় বিশ্বাসী তিনি আনতেন নানারকমের রাজনীতির বই ওগুলির মধ্যে নীলরঙের মলাটযুক্ত 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' বইটি আমাকে বেশ আকর্ষণ করত। বুঝি বা না বুঝি সেটি নিয়ে আমি পড়তাম। বাড়িতে রাখা হত 'স্বাধীনতা', পত্রিকা আসত 'পরিচয়।' বাড়িতে যোগেন নিয়ে আসতেন ছবি, কবিতা, নানারকমের গল্পের বই। ছোড়দার পছন্দ ছিল রোমাঞ্চকর গল্প। 'বাজপাখি', স্বপনকুমার, নীহাররঞ্জন গুপ্ত সবই পড়তাম। আমার মাকে ও দেখেছি খুব বই পড়তেন। কোন বাছবিচার ছিল না। হাতের কাছে নতুন কিছু না থাকলে আমাদের পাঠ্যবইগুলোকে নিয়েও পড়তেন। বাড়িতে ছিল 'অদ্ভুত রামায়ণ' নামে একটি বই। এটি পড়তেও খুব মজা পেতাম। একবার যোগেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' বইটি নিয়ে এলেন। আমি পড়তে গেলে আমাকে ওঁ বারণ করলেন আমি না কি বুঝতে পারব না এই বলে। এতে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল এবং একদিন দুপুরে পুরো বইটা পড়ে ফেললাম। পরে দেখি শেষের কয়েকটি পাতা নেই। এত মন খারাপ হয়েছিল। পরে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে কেনা রবীন্দ্ররচনাবলীতে ' শেষের কবিতা' অনেকবার পড়েও সেই খারাপ লাগাকে ভুলতে পারিনি। ওঁর সংগ্রহ করা বই থেকে পড়েছি অনেক কবিতার বই। প্রথম আধুনিক কবিতার বই হিসেবে পড়েছিলাম অরুণ মিত্রের 'উৎসের দিকে' এবং তরুণ সান্যালের 'মাটির বেহালা'। অরুণ মিত্রের 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে' কবিতাটি আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। পড়েছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', উপেন্দ্রকিশোরের গল্প, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', 'চাঁদের পাহাড়', 'আম আঁটির ভেঁপু' এবং আরও অনেক বই।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা সাজাহানের মৃত্যুশয্যায় ছবিটি এবং নন্দলাল বসুর সাদা কালোর ড্রইং 'গান্ধী'কে সেই সময় দেখেছিলাম যোগেনের কাছে।

বাবার তৈরি কাঠের একটি শোকেস ছিল বাড়িতে। তাতে নানারকম টুকিটাকি জিনিস সাজিয়ে গুছিয়ে সংগ্রহ করে রাখতেন যোগেন। এমন মজার মজার জিনিস ছিল, যেগুলি দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। এগুলির পাশে আর একটি আকর্ষণের বিষয় ছিল ওঁর কবিতার খাতাটি। অনেক ছড়া, কবিতা লেখা ভর্তি খাতাটিতে ছোট ছোট ছবির আঁকিবুকি একধরনের আগ্রহ বাড়িয়ে দিত আমার। আমি সেই ছড়ার ছন্দ কবিতার ভাষা বুঝতে চেষ্টা করতাম মনে মনে। নির্জন

দুপুরের অনেকটা সময় এমনি করেই একা একা আমি বেশ আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারতাম।

মাঝে মাঝে ওঁর অনেক বন্ধুবান্ধব আমাদের বাড়িতে আসতেন। সে দিনগুলোছিল আমাদের কাছে এক একটি উৎসবের দিন। আসতেন অনিতা দি (অনিতা রায় চৌধুরী), কুমকুমদা (কুমকুম মুন্সী), ইন্দ্রনীলদা (ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়) এবং আরও অনেকেই তবে এই কয়েকজনের সঙ্গেই আমাদের বেশি পরিচয় ছিল। সারাদিন ধরে চলতো নানারকমের আলোচনা, আড্ডা, গান, কবিতা পড়া। আমরা মাঝে মাঝে যোগ দিতাম। অনিতাদি রবীন্দ্রসংগীত ধরতেন 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না' কুমকুমদাও শুরু করতেন 'আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে', একটু কম সুরে। এতে অবশ্য রসভঙ্গ হোত না কেননা স্বতস্ফূর্ততায় কোন ছেদ ঘটত না। আমরা খুব উপভোগ করতাম। মাঝে মাঝে যোগেন এবং ওঁর বন্ধুরা আমাকে নানা জায়গায় নিয়ে যেতেন। একবার আমাকে ওঁরা উদয়শঙ্করের 'সামান্য ক্ষতি' নাচ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার এত ভালো লেগেছিল যে বাড়ি ফিরে কবিতাটি মুখস্থ করে ফেলি। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন ছবির প্রদর্শনীতে যোগেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন অনেকবার। রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষের কোন একটি অনুষ্ঠানেই আমি প্রথম দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনেছিলাম 'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ।'

এইভাবে অনেক কিছু দেখা শোনা পড়া সবকিছুকে জড়ো করে নিয়েই ধীরে ধীরে এক সঙ্গে বড় হয়ে ওঠা আমাদের। দাদারা সবাই প্রায় ছবি আঁকতে পারতেন বড়দা নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, মেজদা রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ছোড়দা মনীন্দ্র নাথ চৌধুরী সবাই চেষ্টা করছেন। খানিকটা করে ছবি আঁকার। বাবা তো ভালই আঁকতেন। মায়ের সূচীশিল্প ছিল অনবদ্য। দিদিকেও (সবিতা ভট্টাচার্য) খুব যত্ন করে সেলাই করতে দেখেছি। আমি কোন দিনই সেলাই-এর ধারে কাছে যাইনি বরং ছবি আঁকার কথা খানিকটা ভেবেছি কিন্তু কবিতা পড়তে ভাল লাগত বেশি।

একবার কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে 'রাত্রি' বিষয়ক একটি রচনা পাঠিয়েছিলাম কোথাও। উদ্যোক্তারা কবিতাটি মনোনীত করে সেটি পাঠের জন্য ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলের হলে আমন্ত্রণ জানালে যোগেন সেখানে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। কবি শেখর কালিদাস রায় উপস্থিত ছিলেন ওই সভায়। তখন কী যে আনন্দ, উত্তেজনা। ওঁর সামনে কবিতা পড়ে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল।

১৯৬১ সালের অক্টোবরে কয়েকটি বছরের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাময় সাহিত্য অনুশীলনের অন্যতম ফল হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'নান্দীমুখ' সাহিত্য পত্রটি। প্রথম সংখ্যার সংকলক ছিলেন যোগেন। সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ওঁদের সঙ্গে সম্পাদক মণ্ডলীতে যুক্ত হলেন মানসকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌরীশংকর দে। প্রথম সংখ্যাটিতে ছিল শুধুমাত্র কবিতা কিন্তু পরের সংখ্যায় কবিতার পাশাপাশি গল্প বইয়ের রিভিউ, ছবির প্রদর্শনীর আলোচনাও স্থান পেল। তৃতীয় সংখ্যা থেকে অনেকগুলি প্রচ্ছদে যোগেনের ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। ভেতরেও শিল্পবিষয়ক আলোচনার সাথে রয়েছে গোপাল ঘোষ, বিজন চৌধুরী, অনিতা রায় চৌধুরী, অরুন্ধতী রায় চৌধুরী, যোগেন চৌধুরীর আঁকা ছবির প্রতিলিপি। কিছু দিনের মধ্যেই নান্দীমুখ একটি বিশিষ্ট পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এর প্রথমদিকে লিখেছেন অরুণলাল বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, অনিতা রায় চৌধুরী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, নবনীতা দেব সেন,

জগন্নাথ ঘোষ, উৎপল কুমার বসু, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত সিংহ, তরুণ সান্যাল, বিজন চৌধুরী, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্বনাম খ্যাত আরো অনেকেই। যোগেন নিজের হাতে প্রচ্ছদ তৈরী করেছিলেন কয়েকটি সংখ্যার।

৬ষ্ঠ সংকলন

নান্দীমুখ পত্রিকা প্রকাশের প্রথমদিকে আমার কোন ভূমিকাই ছিল না। নিতান্ত ছোট ছিলাম বলে কেউ বিশেষ পাত্তা দিতেন না। কিন্তু পত্রিকা বেরুবার পর আমি একান্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ে ফেলতাম এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রাণিত হতাম। সে দিনের নান্দীমুখ প্রকাশের মধ্য দিয়েই সম্ভবত রোপিত হয়েছিল আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বীজ। ১৯৭১-৭২ সাল থেকে আমরা এর সঙ্গে যুক্ত হই। মাঝখানে যোগেনের প্যারিস যাওয়া এবং অন্যান্য নানাকারণে বেশ কয়েকবছর পত্রিকাটি ঠিকমত প্রকাশিত হতে পারেনি।

১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে স্কলারশিপ নিয়ে যোগেনের প্যারিস যাবার দিনটির কথা বেশ মনে আছে আমার। আমরা বাড়ির অনেকে মিলে হাওড়া স্টেশনে তুলতে গিয়েছিলাম। ট্রেনে করে বম্বে গিয়ে সেখান থেকে জাহাজে যেতে হবে। তখন অনেক কিছুই বুঝিনি। ভেবেছি কী মজা। কিন্তু এখন বুঝতে পারি আমাদের মত একটি উদ্বাস্তু পরিবারের এক সদস্যের বিদেশ যাত্রার পিছনে থাকে কত কৃচ্ছ্র সাধন, থাকে কতখানি উদ্যম, আশা হতাশার দ্বন্দ্ব। লুকিয়ে থাকে কত করুণ আর্তনাদ।

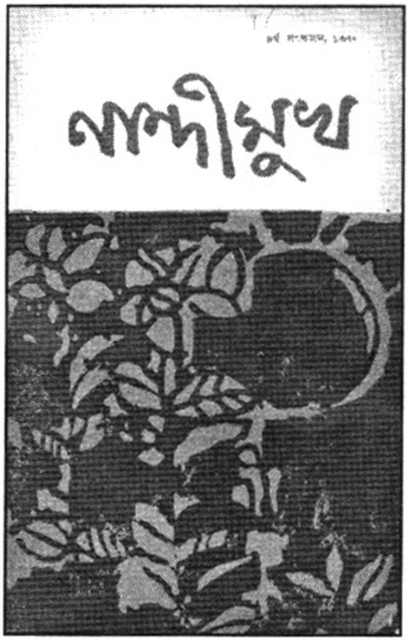

৪র্থ সংকলন

'৬৮ সালে দেশে ফিরে আসার পর যোগেন প্রথমে মাদ্রাজে ছিলেন। মাদ্রাজে থাকার সময়েই যোগেনের বিয়ে হয়। সব থেকে মজার বিষয় হল রাস্তাঘাটে যে শান্ত সুন্দর ছিপছিপে মেয়েটিকে দেখে আমার খুব ভালো লাগতো সেই শিপ্রা চক্রবর্তীই একদিন আমার বৌদি হয়ে এলেন। এত আনন্দ হয়েছিল সেদিন। এখনো পর্যন্ত বৌদির সঙ্গে সকলেরই খুব সুন্দর সম্পর্ক অটুট রয়েছে। মাদ্রাজের পর দিল্লীতে ছিলেন প্রায় চৌদ্দ পনের বছর। ইতিমধ্যে শিল্পী হিসেবে পেয়েছেন সম্মান, প্রতিষ্ঠা, আর্থিক স্বচ্ছলতা।

খুব কাছ থেকে দেখার জন্য একথা বলতে পারি যে ওঁর মতন একজন অসম্ভব অনুভূতিশীল মানুষ খুব বেশি নেই। পরিবারের প্রত্যেকের জন্য ভাবনা চিন্তা সহযোগিতা দায়দায়িত্ব কেমন অবলীলায় নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি। কারুর কোন অসুবিধে হলে নিজে থেকেই এগিয়ে এসে সমাধান করতে চেষ্টা করেন এবং এগুলি সোচ্চারে বলাটাও প্রয়োজন মনে করেন না। টুকরো টুকরো অনেক ঘটনাই এমন আছে। যা দিয়ে যোগেনের ভেতরের মানুষটিকে চেনা যায়।

১৯৮৩তে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দুর্ভিক্ষের জ্যোৎস্নায়' প্রকাশিত হয়। যোগেন সেই সময় দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের curator ছিলেন। সেখানে থেকে আমার বই-এর প্রচ্ছদ এঁকে পাঠান। সঙ্গে কীভাবে ছাপতে হবে, রঙ কেমন হবে। লেখার টাইপ কেমন হবে ইত্যাদি সব খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। আশ্চর্য প্রচ্ছদ হয়েছিল সেটি। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে গণেশ পাইনের ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছিলেন যোগেন।

মা মারা যাবার পর কয়েকদিন কলকাতার বাড়িতে থাকার সময়ে আমার অনেকগুলি কবিতার উপর বত্রিশটি ড্রইং আঁকেন তিনি। মোটা তুলির লাইন ড্রইং-এ কবিতার মেজাজ জুড়ে তৃতীয় মাত্রা এনে দিয়েছে যেন। 'সবুজ ঘাসের রোদ্দুর' নাম দিয়ে সেই ছবি ও কবিতার বইটি ১৯৯৩-এ প্রকাশ করেছিলেন স্বপ্না দেব প্রতিক্ষণ প্রকাশনার পক্ষ থেকে। ওই ছবিগুলি দিয়ে পার্বতী মুখোপাধ্যায়ের Little Gallery তে একটি প্রদর্শনীও করা হয়েছিল। সেই ছবি বিক্রির টাকা যোগেন নান্দীমুখ পত্রিকাকে দিয়ে দেন। 'ঘনিষ্ঠ বসবাস'-এর প্রচ্ছদেও ওঁর আঁকা ছবি ব্যবহার করেছি। এককথায় অসাধারণ। আমার অনেক পরিচিত জনের জন্যও যথেষ্ট মূল্যবান সময় ব্যয় করে তিনি সযত্নে প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। বন্ধুবৎসল যোগেন গল্প আড্ডায়ও মেতে ওঠেন দারুণভাবে, এখনও অফুরান উৎসাহে সংঘটিত করেন ছাত্রছাত্রীদের ছবির প্রদর্শনী, ভাবেন পরিবেশের কথা, নানা বিষয় নিয়ে লেখার কথা, নিজের ছবি আঁকার কথা এবং শেষ পর্যন্ত একথা বলা যায় যে নিজের একান্ত চেষ্টা একাগ্রতা অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে তিল তিল করে তৈরী করেছেন তিনি এবং একজন সার্থক সচেতন শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।